Banglavision
ISSN: 2079-567X
Vol. 15 • No. 1 • April 2015

মুক্তিযুদ্ধে নারী সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব : একটি পর্যালোচনা

ড. ফজিলাতুন নেছা*

সারসংক্ষেপ:

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারী সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব যারা তাঁদের কণ্ঠের জাগরণী গানের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের এবং মুক্তিকামী জনতাকে উজ্জীবিত করেছিলেন সেসকল নারীসঙ্গীত ব্যক্তিত্বের অবদান তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে এ প্রবন্ধে। নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং মিলিত রক্তস্রোতে স্নাত আমাদের স্বাধীনতা। এ সম্মিলিত অবদানে নারী মুক্তিযোদ্ধা ও নারী সমাজের অবদান যথাযথভাবে উল্লেখ না করেই মুক্তিযুদ্ধের মূলধারার ইতিহাস রচিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যেসকল নারী কণ্ঠশিল্পী, নারী শব্দ সৈনিক নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও মুক্তিযোদ্ধাসহ সমগ্র বাঙালি জাতিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের আত্মদানের ইতিকথা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, মুক্তিযুদ্ধে সঙ্গীতের প্রভাব, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সঙ্গীতে নারী এবং কয়েকজন নারী সঙ্গীত ব্যক্তিত্বের ৭১'এর স্মৃতিকথা, মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত- এ বিষয়গুলি উপস্থাপন করা।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

যুগে যুগে বাঙালি সংগ্রাম করেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ববাংলাকে শাসন করা হত উপনিবেশের মতো। বাঙালি জাতির নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পূর্ববাংলা অর্থনৈতিকভাবে শোসিত এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কাঁচামালের যোগানকারী ছিল। জাতীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিকাশের অধিকার না থাকায় জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা ও অধিকারের দাবিতে আত্মদানের মাধ্যমে সূচনা ঘটে বাঙালি স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। ১৯৫২-১৯৭০ পর্যন্ত বাঙালি সংগ্রাম করে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্বায়ত্বশাসন, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতির দাবিতে যা একটি পর্যায় রূপ নেয় মুক্তিযুদ্ধে। বাঙালির এ মহান মুক্তির আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ও উত্তোরনের বিভিন্ন পর্যায়ে এদেশের ছাত্রীসমাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছে।[১] ০১ মার্চ, ১৯৭১ জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে সারা দেশ উত্তাল জনরোষে পরিণত হয়। ক্রমেই এ আন্দোলন বিপ্লবীরূপ ধারণ করে। বিপ্লবী জনতাকে উদ্দীপ্ত করে আন্দোলন সংগ্রামকে আরও বেগবান করে তোলার জন্যে রাজপথে চলমান মিছিলে শ্লোগানের পাশাপাশি গণসঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক গান চলতে থাকে। ৭' মার্চ ১৯৭১ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (রেসকোর্স ময়দান) থেকে বঙ্গবন্ধু 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' যে ঘোষণা দিয়েছিলেন সে মঞ্চে পরিবেশন করা হয়েছিল 'জয় বাংলা বাংলার জয়।' স্বাধীনতার আহ্বান আর প্রতিরোধের গান জনগণকে উজ্জীবিত করে সংগ্রামী চেতনায়।

---

* গবেষক, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১ নীল কমল বিশ্বাস (সম্পা.), *যুদ্ধে যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ দুনিয়া কাপানো ২৬ দিন*, ঢাকা: এশিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮, পৃ.৩২৯-৩৩২।

ষড়ঋতুর ছয়টি সুরে বাঁধা এবং প্রকৃতির সাথে গ্রথিত স্বপ্ন বাঙালীর চির চেনা ভুবন। যুগে যুগে সংঘাতে সংকটে প্রকৃতির গভীর আবেগে দেশাত্ববোধক জাগরণী গান এক সুন্দর জীবন প্রত্যাশায় জনগণকে যেমন দেশপ্রেমে আপ্লুত করেছে তেমনি প্রয়োজনে দ্রোহী করে তুলেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধে। মাতৃভাষা রক্ষা করতে যেয়ে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে বাংলার ভাষার গান জাতিসত্ত্বা ও নৃ-গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্রবোধ রক্ষায় পৃথিবীর গৌরবময় ইতিহাসের অন্যতম অহংকারী অংশ।

বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বুলেটের মতো শব্দমালা তৈরি, রক্তে ফিনকি দেয়া সুরে উজ্জীবিত শিল্পীদের কণ্ঠে গীত মুক্তিযুদ্ধের গান– পাকিস্তানী হায়েনাদের নৃশংসতা, নারকীয় হত্যাকাণ্ড মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে বাঙালী জনগণের মনোবলকে যেভাবে উদ্দীপ্ত রেখেছে, বিপ্লবী সাহসে উজ্জীবিত করে শত্রুকে প্রতিরোধ ও প্রত্যাঘাত করার সাহস যুগিয়েছে তা ইতিহাসে গৌরবদীপ্ত অধ্যায় হয়ে আজীবন বেঁচে থাকবে। অবিরাম বিনির্মাণ করবে মুক্তির আলোকিত সড়ক। দেশাত্মবোধক গান, গণসঙ্গীত, ভাষার গান, মুক্তিযুদ্ধের গান যে নামেই পল্লবিত হোক এর সুগন্ধ বাঙালীর আবেগের রংয়ে মিশে এক স্বপ্নীল জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে করে বিকশিত। প্রস্ফুটিত এ ধারার গানের নির্যাস বা ঠিকরে পড়া আলো মানে জীবনের গান।[২]

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পটভূমি কয়েক শ বছরব্যাপী বিস্তৃত। সেই বিস্তৃত সময় পরিসরের অঙ্গীভূত অংশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সেই যুদ্ধের সংগঠনে ও তার বিজয়ে নারী জনগোষ্ঠীর অবদান পুরুষের তুলনায় কম নয় বরং সমকৃতিত্বের পরিচয়বাহী, সেটা আজ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় প্রমাণিত সত্য। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ধাপেই সৃজনশীল, দক্ষ, অকুতোভয় বীর, যোদ্ধা ও সংগঠক হিসেবে নারীর অবদান তথ্যসমৃদ্ধ। তা সত্ত্বেও পুরুষের ভূমিকা যেমন দৃশ্যমান, তেমনি দৃশ্যমান নয় নারীর ভূমিকা ও অবদানের বিষয়টি। যুগযুগ ধরে নারীকে অদৃশ্য রাখা এবং নারীর ইতিবাচক ভূমিকা ও পরিচয়কে অদৃশ্য করে রাখার মধ্য দিয়ে তাকে সমাজমানস থেকে প্রকারন্তরে ইতিহাস থেকে বিস্মৃত করে দেয়ার প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত।[৩] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত সনাতন ও পশ্চাৎপদ। এর বিরুদ্ধে নারীসমাজ সংগ্রামরত ছিলেন ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমল থেকেই। স্বাধীনতার পর একুশ শতকেও নারী সমাজের সেই সংগ্রাম শেষ হয়নি। শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও মর্যাদার দিক থেকে নারীসমাজের কিছুটা পরিবর্তন হলেও তাদের সামগ্রিক অবস্থানগত পরিবর্তন একেবারেই হয়নি।[৪] মুক্তিযুদ্ধের ২৯ বছর পর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রত্যক্ষ অবদানের স্বীকৃতি পেয়েছেন নারীরা। সেই বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা চলছে। দীর্ঘসময়ের অস্বীকৃতি, বিস্মৃতি ও অবহেলার পর ইতিহাস এখন বদলে যাচ্ছে : নারী পরোক্ষ মুক্তিযোদ্ধা নন, প্রত্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেই দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছেন।[৫]

মুক্তিযুদ্ধে সঙ্গীতের প্রভাব

জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে নিবেদিত গান দেশাত্মবোধক বা স্বদেশী সঙ্গীত বা গণসঙ্গীত। বাংলা দেশাত্মবোধক গানের সূচনা হয় উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁর অনুসারীদের সঙ্গীতের মাধ্যমে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এর পর্যায় ক্রমিক বিকাশ ঘটে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির 'জাতীয় মেলা' এবং 'সঞ্জীবনী সভা' ছিল এর লালন ক্ষেত্র। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সঙ্গীতের এ নতুন ধারা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এ সময়

---

২ মো: ফেরদৌস হোসেন ভুঁইয়া, *জীবনের গান মুক্তির গান (১৯৪৭-২০০৫):আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতের উপর একটি অনুসন্ধান*, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, ২০১১।

৩ মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১১,পৃ. ১৯।

৪ মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৭৪।

৫ ঐ, পৃ.৭৫।

থেকে ইংরেজ শাসনের বিরূদ্ধে প্রতিবাদী মানসিকতা সৃষ্টি এবং স্বাজাত্যবোধ জাগরিত করার জন্য একের পর এক দেশাত্মবোধক গান রচিত হতে থাকে। দেশের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা দেশের বীর নায়কদের বিরত্বগাথা এসব গানের বিষয়বস্তু। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল, মুকুন্দদাস, ইকবাল, তালিম হোসেন, ফররুখ আহমদ প্রমুখ কবি ও গীতিকার প্রচুর দেশপ্রেমমূলক গান রচনা করেন। দেশে কোন সংকটময় মুহূর্তে দেশাত্মবোধক গান জনগনের মনে আশা ও শক্তি সঞ্চার করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশাত্মবোধক গান দেশের সাধারণ জনগণ এবং রণক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের মনে প্রবল শক্তি, সাহস ও আশার সঞ্চার করেছিল। অপরদিকে বাংলায় গণসঙ্গীতের সূচনা হয় ১৯৪৩ সালে গণনাট্য সংঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী প্রমুখ তাঁদের অনন্য সাধারণ প্রতিভাবলে সঙ্গীতের এ নতুন ধারাকে সম্প্রসারিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন। গণসঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রমজীবী মানুষকে সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার বিরূদ্ধে সোচ্চার করা, অন্যায়ের বিরূদ্ধে তাদের সংগঠিত ও সংগ্রামশীল হতে উদ্বুদ্ধ করা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার আদায়ের মাধ্যমে একটি সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ জোগানো। বিশ শতকের মধ্যভাগে গণসঙ্গীতের দুটি বিশেষ চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। এ সময় জাতীয় মুক্তি অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবিকে কেন্দ্র করে এমন কিছু গান রচিত হয় যা ইংরেজ শাসন থেকে ভারতের মুক্তির আন্দোলনে প্রচণ্ড শক্তি জোগায়। সেসব গান শুনে দেশের মুক্তিকামী যোদ্ধারা প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত হন। এর পাশাপাশি চারণ কবি মুকুন্দদাস এবং নজরুল যেসব গান রচনা করেন তাতে ফুটে উঠে শোষণহীন সমানাধিকার সম্পন্ন সমাজ গঠনের ছবি।[৬]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশ্বের গণমাধ্যমগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' তার মধ্যে অন্যতম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বাঙালী জাতি ও মুক্তিযুদ্ধের প্রাণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে। এ বেতার কেন্দ্র মোট চারটি পর্যায় বিভক্ত। প্রথম ২৬ মার্চ '৭১ সালে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কালুর ঘাট ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রচার শুরু।

দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের শিল্পী বেলাল মোহাম্মদসহ দশ শব্দ সৈনিক কালুরঘাট ট্রান্সমিটার ভবনে রক্ষিত এক কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ট্রান্সমিটার বহন করে সীমান্তের ওপারে আগরতলায় নিয়ে যান। আগরতলায় স্থানীয় প্রশাসন, বি.এস.এফ. এবং বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সহায়তায় এ ট্রান্সমিটার দিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

তৃতীয় ১০এপ্রিল '৭১ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমেদের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে বিপ্লবী অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। এ বাণী বিদ্যুৎগতিতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাশ্ববর্তী ভারতীয় পত্র-পত্রিকা, বেতার ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হয়। আগরতলায় নিয়ে যাওয়া ট্রান্সমিং থেকে কসবা আখাউড়া থেকে ১১ এপ্রিল '৭১ বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এর একটি রেকর্ডকৃত ভাষণ ইথারে ভেসে আসে এবং তা বারবার প্রচারিত হয়। পরবর্তীতে এ ভাষণ আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। চতুর্থ কেন্দ্র ২৫ মে '৭১ সালে রোজ মঙ্গলবার প্রবাসে মুজিবনগর সরকার কলকাতায় ৫৭/৮ বালিগঞ্জ, লোয়ার সার্কুলার রোডের একটি দ্বিতল ভবনে সংগঠিত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ভরত সরকার কর্তৃক প্রতি কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ শক্তিসম্পন্ন এ বেতার কেন্দ্রের সংগঠন এবং পরিচালনায় সার্বিক দায়িত্ব পালন করেছে প্রবাসে ভারতের মাটিতে গঠিত প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে টাঙ্গাইলের আব্দুল মান্নান এম.এন.এ। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে দীর্ঘ ন'মাসব্যাপী বিপ্লবী অনুষ্ঠান প্রচারে এ বেতার কেন্দ্র মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

---

৬ *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-৬, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১, পৃ.২১৩।

দৈনিক সকাল ৭টা ও সন্ধ্যা ৭টা মিডিয়াম ওয়েভ ৩৬১.৪৪ মিটারে ব্যান্ডে প্রতি সেকেন্ডে ৮৩০ কিলোসাইকেলে মাত্র দুটি অধিবেশন দিয়ে শুরু হয়। অনুষ্ঠানসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয় বাংলা ও ইংরেজি খবর পর্যায়ক্রমে সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান, 'অগ্নিশিখা' 'চরমপত্র' বিশেষ কথিকা এবং দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান 'জাগরণী' ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিও সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়। উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠান বাণীবদ্ধ করার জন্য স্টুডিওর ন্যায় কোনও শব্দ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল না। ছিল না প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রী। অবশ্য পরবর্তীকালে এ অবস্থার অভাবপূরণ হয়েছিল। মুজিবনগর সরকারের প্রতিরক্ষা সচিব আব্দুস সামাদ তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রেস, তথ্য, বেতার ও চলচ্চিত্র বিভাগের দায়িত্ব আগষ্ট '৭১ পর্যন্ত পালন করেন। ১ সেপ্টেম্বর'৭১ থেকে সচিব হিসেবে এ বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন আনোয়ারুল হক খান। স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষে মুজিবনগর থেকে ফিরে এসেও তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে প্রায় মাসাধিককাল দায়িত্ব পালন করেছেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রশাসন ও কলাকৌশলী ও নীতি নির্ধারণী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন- জনাব তাজউদ্দিন আহম্মদ ,তথ্য, প্রতিরক্ষা ও প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে প্রচার মাধ্যমের সার্বিক দায়িত্বে : টাঙ্গাইলের আব্দুল মান্নান এম.এন.এ।[৭]

গানের সঙ্গে বাঙালীর প্রাণের সংযোগ। প্রায় ২০০ বছর আগে প্রথম বাংলা নাটকের রচয়িতা গেরাসিম লেবেদফ বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্টের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছিলেন, বাঙালী গান ভালোবাসে। এই সংযোগ, এই ভালোবাসা কেবল আনন্দ আস্বাদন থেকে নয়, গানের মধ্যে বাঙালী প্রকাশ করেছে দুঃখ বেদনার অনুভূতি, গভীর ভাবনা, ক্রোধ-ক্ষোভ, প্রতিরোধ-প্রতিবাদের ভাষা। সুখের দিনে গান হয়েছে বাঙালীর আনন্দের অনুষঙ্গ, তেমনি সংকটকালে প্রেরণা ও সাহসের অফুরান উৎস। দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রামের প্রত্যয় ও উদ্দীপনায় ভাস্বর এই গান কণ্ঠে ধারণ করে যাঁরা অহরনিশি মানুষের হৃদয়তলে আসন করে নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নারী সঙ্গীত ব্যক্তিত্বগণ অপরিসীম ভূমিকা রেখেছেন।[৮]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ইতিহাস সুদীর্ঘ দিনের, মূলত ১৯৪৮, ১৯৫২ সালের ভাষা সংস্কৃতির আন্দোলনের মাধ্যমেই মূল সংগ্রামের সূত্রপাত। এই সংগ্রামের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। এ ক্ষেত্রে শিল্পীসমাজের ভূমিকা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার জন্য দেশের মানুষকে তাঁরা করেছে উদ্বুদ্ধ। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণকে তাঁরা হানাদারদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তুলেছিলেন। তাঁদের সেই প্রতিবাদের ভাষা ছিল সংগীত। কারণ সুর যেভাবে একটি বক্তব্যকে সহজেই মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে অন্য অনেক কিছুতেই তা সহজে সম্ভব হয় না। যেমন মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালনের মাধ্যমে ছায়ানট প্রতিষ্ঠা বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য একটি ব্যতিক্রমী অনুপ্রেরণা। ছয় দফা আন্দোলনেও বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক গান যেমন– ''মানুষ হ, মানুষ হ আবার তোরা মানুষ হ, বিশ্ব মানব হবি যদি শাশ্বত বাঙালী হ'', ''বাংলা মা দুর্নিবার আমরা তরুণ দল'', রবীন্দ্রনাথের গান, ''যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা'', ''ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাটি আমার দেশের মাটি'', ''সার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এই দেশে''– গেয়ে মানুষকে প্রেরণা দান করেছিলেন শিল্পীসমাজ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় প্রয়োজনে কিছুসংখ্যক শিল্পী ওপারে চলে যান এবং 'মুক্তিযুদ্ধ শিল্পী সংস্থা' গঠন করেন। যার সেক্রেটারি ছিলেন মাহমুদুর রহমান বেণু এবং প্রেসিডেন্ট ছিলেন সন্‌জিদা খাতুন। এই পর্যায়ে একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান 'রুপান্তরের ইতিহাস' মঞ্চায়িত হয় রবীন্দ্র সদনে। অনুষ্ঠানের গ্রন্থনায় ছিলেন শাহরিয়ার কবির। ধারা বিবরণীতে হাসান ইমাম এবং মঞ্চ সজ্জায় মোস্তফা মনোয়ার। এতে বাঙালী জাগরণের সব ইতিহাস ছিল। এরপর দিল্লীতে একটি আন্তর্জাতিক

---

[৭] মোহাম্মদ শাহ্‌জাহান সিরাজী, *সংবাদপত্রে একাত্তরের স্বাধীনতা*, ঢাকা: জোনাকী প্রকাশনী,২০০১,পৃ.২৬৩-২৬৪।

[৮] স্‌নজীদা খাতুন/ মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১১১-১১২।

সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নানা দেশ, নানা জাতিকে এদেশের নিপীড়ন পেষণের ইতিহাস জানানো হয়। বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে জনগণকে সমব্যথী করে তোলেন তাঁরা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শরণার্থী শিবিরে এবং মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে গিয়ে গান গাওয়া। এই সময়ে অনেকে আবেগ তাড়িত হয়ে শিল্পীদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাত এবং 'জয় বাংলা' বলে জয়ধ্বনি করত। সেই সময় শেখ লুৎফর রহমানের গান ও শিল্পী কামরুল হাসানের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। এসব অনুষ্ঠানের সংগৃহীত অর্থ দলগতভাবে একটি সাধারণ তহবিলে রাখা হতো। সেখান থেকে প্রয়োজনের সময় শিল্পীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হতো।

প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অবদান সম্পর্কে বলতে গেলে কারও একক ভূমিকা বলা খুব কঠিন। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিটি কাজে, প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকের দলগত প্রচেষ্টায় আজকের এই স্বাধীনতা।[৯] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকা ও অবদানের ইতিহাস লেখা শুরু হয়েছে বিশ শতকের আশি ও নব্বইয়ের দশক থেকে। এই ইতিহাস লিখেছেন এবং এখনো লিখে চলেছেন নারী আন্দোলন ও নারী উন্নয়নের নেতা নেত্রী এবং নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিরত সংগঠকেরা। পাশাপাশি লেখক-সাহিত্যিক ও কবিরা লিখে চলেছেন গল্প-উপন্যাস ও কবিতা। ১৯৯৭ সালে এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিও সুস্পষ্ট হয়েছে। উল্লেখিত বছরে সরকার গৃহীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে প্রথমবারের মতো বলা হয় : স্বাধীনতাযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অসামান্য অবদান রেখেছে।[১০]

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সঙ্গীতে নারী ব্যক্তিত্ব

বাংলা ভাষার ইতিহাসে বাঙালীর মুক্তির গান মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন সময় এক স্বর্ণপ্রসূ গণসৃজন বিষয় হিসাবে ভূমিকা পালন করে।[১১] ঢাকা থেকে সংস্কৃতিমনা যেসব ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা দুটি ব্রত গ্রহণ করেছিলেন: ১.ভারতের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ প্রচারের জন্য একটি গানের স্কোয়াড তৈরি করা এবং ২.বিভিন্ন ক্যাম্প ঘুরে দেশাত্ববোধক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শরণার্থীদের উজ্জীবিত করা। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে সাংস্কৃতিক তৎপরতার সংগঠক-কর্মী ছিলেন সালমা ইসলাম, তাঁকেই এই স্কোয়াডের মেয়েদের সংগঠিত করার দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁরা নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী স্বেচ্ছাসেবার কাজ করেছেন। সন্‌জীদা খাতুন ছিলেন অন্যতম শিল্পী-সংগঠক। লায়লা হাসান, শাহীন, ডালিয়া, নায়লা, লুবনা, শীলা, শর্মিলাসহ আরও বহু শিল্পীকে সংগঠিত করার কাজ করেন তিনি।[১২] কয়েকজন নারী সঙ্গীত ব্যক্তিত্বের ৭১' এর স্মৃতিকথা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

কল্যাণী ঘোষ

বাঙালির জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়। ৭১' এর মার্চের শেষের দিকে চট্টগ্রাম শহর আগুনে পুড়ছিল। শহর ছেড়ে নদী পথে গ্রামের বাড়ি রাউজানে আশ্রয় নেন। কিন্তু সেখানে বেশি দিন নিরাপদে থাকতে না পেরে ২১ এপ্রিল পাহাড়ি দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে রামগড় সীমান্ত পার হয়ে সাব্রুমে এসে পৌঁছান। দেশাত্মবোধক ও গণসঙ্গীতের মাধ্যমে জনগনকে উজ্জীবিত করার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রখ্যাত সুরকারদেও সুর-সংযোজনায় 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, নোঙর তোল তোল, তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব, আহা ধন্য আমার জন্মভূমির পূণ্য সলিল, নওজোয়ান সব এগিয়ে চলো, হে মহামানব, বাঁধ ভেঙে দাও, কারার

---

[৯] ঐ, পৃ. ১১২।

[১০] *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ৮ই মার্চ ১৯৯৭।

[১১] আবদুশ শাকুর, *বাঙালীর মুক্তির গান*, মাওলা ব্রাদার্স,২০০৭,পৃ.১৩০।

[১২] মালেকা বেগম, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১৪৮।

ঐ লৌহ কপাট প্রভৃতি উদ্দীপনামূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। নারী সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন উমা খান, মালা খান, রূপা ফরহাদ, নাসরিন আহমদ শিলু প্রমুখ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কার্যক্রম ছাড়াও তিনি ৩৫ জন কণ্ঠ শিল্পী, বাদ্য যন্ত্র শিল্পী, আবৃত্তিকার নিয়ে 'বাংলাদেশ তরুণ শিল্পীগোষ্ঠী' গঠন করেন। এ স্কোয়াড নিয়ে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বর্ধমান, কল্যাণী, বারাসাত, দুর্গাপুর, আসানসোল, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, বসিরহাট, সল্টলেক, মহাজাতিসন, খলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠান করে মক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখেন। তাঁর সঙ্গে আরও যাঁরা সহযোদ্ধা হিসেবে ছিলেন তাঁরা হলেন- পূর্ণিমা দাশ, স্বপ্না রায়, দেবী চৌধুরী, ঝর্ণা ব্যানার্জী, অর্চনা চৌধুরী, রত্না দাশ, মিতালী মুখার্জী, স্বপন চৌধুরী, মোহিনীমোহন চক্রবর্তীসহ অনেকে। ড. সনজীদা খাতুনের নেতৃত্বে গঠিত 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থার সাথেও যুক্ত হয়ে তিনি কাজ করেন।[১৩]

নমিতা ঘোষ

২৫ মার্চের রাতে ঢাকা শহরে অবস্থান করছিলেন। ২৭ মার্চ ঢাকা ছেড়ে বিক্রমপুরের দিকে যান। কুমিল্লার আখাউড়া বর্ডার পেরিয়ে সেখানে বেশ কিছু দিন অবস্থান করেন। ১৬ এপ্রিল আগরতলা ক্যাম্পের শরনার্থী হন। শিল্পী পরিচয় পেয়ে কংগ্রেস নেতা প্রিয় দাস চক্রবর্তী ক্যাম্প থেকে তাঁকে নরসিংদী পলিটেকনিক্যাল হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। রাজবাড়ী ক্যাম্পে দেখা হয় আব্দুল জব্বার ও আপেল মাহমুদের সাথে। ১৯৬৯ সালে গঠিত বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠীর উদ্দোগে ৭১' সালে ক্যাম্পে ক্যাম্পে গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা দেয়ার কর্মসূচি গৃহীত হয়। গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে আগরতলার বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করে অর্থ, জামা-কাপড়, খাবার ইত্যাদি সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে পাঠাতেন। পরবর্তীতে কলকাতায় ভবানীপুরে সংহতি শ্রী মহিলা হোস্টেলে থাকেন এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক আমিনুল হক বাদশা তাঁকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিয়ে যান। প্রথম নারী হিসেবে বেতার কেন্দ্রে কণ্ঠ দেন। বেতারে তাঁর পরিবেশিত উল্লেখযোগ্য গান- এক সাগর রক্তের বিনিময় বাংলার স্বাধীনতা..., জয় বাংলা বাংলার জয়..., সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা ..., একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি..., রক্তের প্রতিশোধ রক্তেই নেবো..., সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের...প্রভৃতি। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে ব্যারিস্টার বাদল রশিদের নেতৃত্বে চিত্র পরিচালক দিলিপ সোমের বিক্ষুব্ধ বাংলা গীতি আলেখ্য নিয়ে ১৪ সদস্যের একটি কালচারাল ট্রুপস নিয়ে মক্তিযুদ্ধের জন্য ফান্ড তোলার উদ্দেশ্যে ভারতের বোম্বেসহ দিল্লী, গোয়া, পুনে, কানপুর বিভিন্ন জায়গায় গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। ১৪ সদস্যের মধ্যে নারীদের মধ্যে ছিলেন নমিতা ঘোষ স্বপ্না রায়, মাধুরী আচার্য্য, রমা ভৌমিক প্রমূখ। তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের জন্য ১১ লাখ টাকা, কম্বল, পুলভার, শতরঞ্জি, ওষুধসামগ্রী সংগ্রহ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জমা দেন। এ সকল অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন বোম্বের চিত্রাভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমান, সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলীল চৌধুরী, সবিতা চৌধুরী, বিশিষ্ট সাংবাদিক যুগ্ম সচিব সলীল ঘোষ ও বোম্বের সঙ্গীত পরিচালক বাপ্পী লাহিড়ী।

বোম্বে থেকে ফিরে কলকাতায় জোড়া বাগান পার্ক, স্কুল-কলেজ, পার্ক সার্কাসের মাঠে এবং বাংলাদেশের শরণার্থীদেও সাহায্যার্থে রবীন্দ্র সদনে যৌথভাবে বিচিত্র অনুষ্ঠান হয়। সমর দাসের পরিচালনায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এসময় ভারতীয় নারী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সন্ধা মুখার্জী, বনশ্রী সেনগুপ্ত প্রমূখ। ১২ ডিসেম্বর ১৯৭১ সকাল ১০ টায় প্রিয়া সিনেমা হলে বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠী নিবেদিত বিক্ষুব্ধ বাংলা ও বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসূচি শেষ করেন। এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী নারী শিল্পীবৃন্দ হলেন- রূপা খান, মালা খান, নমিতা ঘোষ প্রমূখ।[১৪]

---

[১৩] ড. জাহিদ হোসেন প্রধান (সম্পা.), *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস*, ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৮, পৃ.২০৯-২১১।

[১৪] ঐ, পৃ.৯৫-১০০।

বুলবুল মহলানবীশ

পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি থেকে ঢাকায় ফিরে এসে যে বিষয়গুলি তাঁর মনে নাড়া দিয়েছিল তা হলো প্রথমত: করাচির রেশনের চাল ছিল সরু এবং পরিষ্কার এবং ময়দা, আটা, ঘি, চিনি, সেমাই সবই দেয়া হত ন্যায্যমূল্যে। কিন্তু ঢাকর রেশনের চাল মোটা এবং খারাপ। দ্বিতীয়ত একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে বারণ করা হয়েছিল এবং নজরুলের 'ভোর হলো দোর খোল' গানের শেষ লাইন 'জয়গানে ভগবানের'র স্থলে 'জয়গানে রহমানে' গাইতে বলা হয়েছিল। তিনি সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করে নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং বাঙালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার চক্রান্তগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন। ঊনসত্তরে প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্বে ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হন এবং নিয়মিত সভা সমাবেশে অংশ নিতেন।

২মার্চ '৭১ নারিন্দা-দয়াগঞ্জ এলাকার সাংবাদিক আবেদ খানকে আহ্বায়ক এবং মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়াকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। বাবা ব্রিটিশ আর্মিতে ছিলেন বলে তাঁদের নারিন্দার বাসায় ট্রেনিং ক্যাম্প করা হয় এবং প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা শহরে শুরু হয় ইতিহাসের স্মরণকালের হত্যাযজ্ঞ। ৩০ মার্চ সপরিবারে নরসিংদী চলে যান। এসময় তাঁদের অন্যতম সঙ্গী ছিল আকাশবাণী কলকাতা, আকাশবাণী আগরতলা, রেডিও পাকিস্তান। নরসিংদীতে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি প্রধান ঘাঁটি থাকায় পাক বাহিনী এখানেও চলে আসে। এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে কুমিল্লার নবীনগরে গিয়ে পৌঁছান এবং এপ্রিলের শেষে আগরতলা যান।

জুন মাসে আকাশবাণী কলকাতার 'পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য' অনুষ্ঠানের অডিশনে নির্বাচিত হন নজরুলগীতি পরিবেশনের জন্য। এরপর তিনি মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী সংস্থার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। 'রুপান্তরের গান' গীতি আলেখ্য অনুষ্ঠানের জন্য তাঁদের স্কোয়াড বাহিনী প্রশংসা কুড়িয়েছিল। নাট্যকার কল্যাণ মিত্র 'জল্লাদের দরবার' নাটকের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দান করেন। সেসময় তিনি যে সকল নারী সহকর্মীর সঙ্গে কাজ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন- কল্যাণী ঘোষ, উমা চৌধুরী, নাসরীন আহমেদ শিলু, সত্যরূপা খান, রমলা সাহা, মালা খান প্রমুখ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সর্বকনিষ্ঠ শিল্পী ছিলেন শিল্পী মহালনবীশ তাঁর ছোট বোন এবং সঙ্গীত শিল্পী শক্তি মহালনবীশ তাঁর মেজ বোন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ব্যানারে বেশ কিছু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, আকাশবাণী কলকাতা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, গান গাওয়া নাটক করা, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত গঠন করা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কাপড়, খাবার, ওষুধপত্র সংগ্রহ করে বিভিন্ন ক্যাম্পে বিতরণ করায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এ সময়ের বেশ কিছু হৃদয় ছঁয়ে যাওয়া গানে তিনি কণ্ঠ দিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল- পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, নোঙ্গর তোল, স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে, রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি বাংলাদেশের নাম ইত্যাদি। রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত-জীবনানন্দ এবং দ্বিজেন্দ্র-অতুল-রজনীকান্ত প্রমুখের গান গেয়েছেন পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধাদের জন্য ফান্ড সংগ্রহ করেছেন। প্রতিটি শিল্পী, কলা-কুশলী, নাট্যকার, গীতিকার, সংবাদ পাঠক সকলেরই তখন একটাই প্রার্থনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ১৬ ডিসেম্বর বিকাল ৪টা বহু প্রতীক্ষিত বিজয় ঘোষণার অপেক্ষায় সকলে, রিহার্সেল চলছে... *'বিজয় নিশান উড়ছে ওই খুশির হাওয়ায় ওই উড়ছে বাংলার ঘরে ঘরে মুক্তির আলো ওই ঝরছে'*।[১৫]

[১৫] ঐ, পৃ.১০২-১২৮।

মালা খান

২৫ মার্চ ডিআইটি স্টেশনে রেকর্ডিং ছিল কিন্তু সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে কাওকে না পেয়ে ফিরে আসেন দুই বোন (রূপা ফরহাদ)। তাঁরা কমলাপুর স্টেশনের পূর্বদিকে ঠাকুরপাড়া, মায়া কাননে অবস্থান করছিলেন। ২৭ মার্চ বেরাইদ চলে যান। এপ্রিলে তাঁর বাবা আব্দুল জব্বার খান, দুই ভাই এবং তাঁদের মামাকে (সাংবাদিক, জনমত, লন্ডন) নিয়ে কলকাতা চলে যান। এ সময় কখনও ধানমণ্ডি কখনও ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে থেকেছেন এবং কোথাও নিরাপত্তা পাচ্ছিলেন না অবশেষে কলকাতা যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। জুলাই এর মাঝামাঝি সময়ে নরসিংদী হয়ে আগরতলা এসে পৌঁছান। সেখানে এসে আপন জনের সঙ্গে দেখা হয়। সকলে কলকাতা যান, তাঁর পিতা আব্দুল জব্বার খান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উপদেষ্টা এবং চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান ছিলেন। তাঁর এক ভাই জাহাঙ্গীর হায়াৎ রুনু গিটার বাজাতেন এবং আরেক ভাই মোজাফ্ফর হায়াৎ জুলু নাটকে অংশ নিতেন। তাঁরা দু বোনের ছাড়াও যে সকল নারী সঙ্গীত শিল্পী গান করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কল্যাণী ঘোষ, উমা নন্দী, নমিতা, কুইন রফিকুল আলম প্রমুখ। সুরকারদের মধ্যে ছিলেন সমর দাস, অজিত রায়, সুজেয় শ্যাম, প্রণোদিৎ বড়ুয়া, আব্দুল গনি বোখারী, আপেল মাহমুদ প্রমুখ।[১৬]

রূপা ফরহাদ

মালা খানের বোন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম শিল্পী। রেডিও-টেলিভিশনের অন্যতম তালিকাভুক্ত শিল্পী ছিলেন। ২৫ মার্চের পর থেকে তিনি রেডিও-টেলিভিশনের কোন অনুষ্ঠানে অংশ নেন নি। প্রচুর ডাক আসতে থাকে অনুষ্ঠান পরিচালকের নিকট থেকে কিন্তু তিনি সকল অনুষ্ঠান বাতিল করেন। ঢাকা রেডিও শিল্পীর তালিকা থেকে তাঁর নাম কেটে দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তিনি মাথা নত করেননি, দেশমাতৃকার টানে মুক্তিকামী মানুষের দলে নিজেকে সামিল করেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দিয়েছেন এবং কণ্ঠে তুলে নিয়েছিলেন লক্ষ কোটি মানুষকে উজ্জীবিত করার মহামন্ত্র। তিনি এবং তাঁরা জয়ী হয়েছিলেন। যুদ্ধের ব্যস্ততার মধ্যে ঈদ এলো, যুদ্ধবন্দী মানুষদের কিছুটা আলোড়িত করার জন্য গীতিকার শহীদুল ইসলাম রচনা করলেন 'চাঁদ তুমি ফিরে যাও দেখো মানুষের খুনে খুনে রক্তিম বাংলা', গানটির সুর দিলেন অজিত রায় এবং গানটি গাইলেন রূপা ফরহাদ। ঈদের চাঁদ উঠলে সন্ধ্যা থেকে গানটি বহু বার প্রচারিত হয় এবং শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করে যায়। যেসকল গানে তিনি কণ্ঠ দিয়েছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য'; 'নোঙ্গর তোল তোল'; 'সংগ্রাম আজ সংগ্রাম'; 'আমার নেতা তোমার নেতা'; 'আমি একবাংলার মুক্তি সেনা'; 'এবার উঠেছে মহাঝড়'; 'এ ঘর দুর্গ'; 'হুঁশিয়ার বাংলার মাটি'; 'রক্তের প্রতিশোধ'; 'তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব'; 'রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি' প্রভৃতি।[১৭]

শাহীন সামাদ

মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামমুখর দিনগুলোতে রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে দীপ্তকণ্ঠে গান গেয়ে প্রেরণা জাগিয়েছেন মুক্তিসেনাদের অন্তরে। ২৫ মার্চ রাতে তিনি তাঁদের লালবাগের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের দেশের জন্য কিছু করার দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি ১৬ এপ্রিল ১৯৭১ সালে কুমিল্লা হয়ে আগরতলা ক্যাম্পে এবং পরে এক আত্মীয়ের বাড়ি পৌঁছান। জুলাই মাসে ওয়াহিদুল হক ঢাকা থেকে এসে মুক্তি সংগ্রামীশিল্পী সংস্থা গঠন করেন। এর সভাপতি হন সনজীদা খাতুন এবং সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বেণু। এ দল বিভিন্ন এলাকায় যেয়ে অনুষ্ঠান করতেন। ১৭ জনের থেকে ১১৭ জনের দলে পরিণত হয়। মাস শেষে শিল্পীদের ১০০ টাকা করে দেয়া হত। গণসঙ্গতি, নজরুল সঙ্গীত ইত্যাদি গান গাইতেন। এ সময় টালিগঞ্জে টেকনিশিয়ান রেকর্ডিং স্টুডিওতে এগারোটি গান রেকর্ডিং করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে পাঠানো হয় প্রচারের জন্য। যুদ্ধের অধিকাংশ সময় তিনি মুক্তাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় ট্রাকে করে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে বেড়ান এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

---

[১৬] ঐ, পৃ.১৬৪-১৬৯।

[১৭] সাক্ষাৎকার গ্রহণ (জুলাই ০১,২০১১)।

'মানুষ হ মানুষ হ আবার তোরা মানুষ হ'; 'বাংলা মা'র দামাল সন্তান'; 'এই শিকল পরা ছল মোদের'; 'জনতার সংগ্রাম চলবেই চলবে'; 'বিপ্লবের ঐ রক্তে রাঙা'; 'ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি'; 'মানবো না মানবো না' ইত্যাদি গান গুলি পরিবেশনের মাধ্যমে মানুষের মনে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রীত করেছিলেন।[১৮]

শীলা (ভদ্র) সাহা

৭১' এর ২৫ মার্চ রাতে তিনি পিতা মাতার সঙ্গে ঢাকার ফরাশগঞ্জে (লালকুঠি) অবস্থান করছিলেন। ২৫ মার্চ রাতে পাক বাহিনীর অতর্কিত গণহত্যায় তাঁরা নিরাপদ স্থানে যেতে পারেন নি। তাছাড়া তাঁদের বাড়ির পাশেই পাক বাহিনীর ক্যাম্প ছিল। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় বাড়ি সংলগ্ন বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে কেরানীগঞ্জের সুভাড্যা গ্রামে আশ্রয় নেন। এরপর দেশের বাড়ি কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানাধীন শ্রীকাইলে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং এপ্রিলে আগরতলায় গিয়ে পৌঁছান। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহনের মহান ব্রত নিয়ে কলকাতায় এসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দু বোন শিপ্রা ভদ্র ও শুক্লা ভদ্র। মঞ্জুলা দাস গুপ্ত, বুলবুল মহলানবীশ, মিতালী মুখার্জী প্রমুখ নারী শিল্পীদের সঙ্গে একত্রে তিনি দলীয়ভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করে পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৯]

মঞ্জুলা দাস গুপ্ত

তিনি বড় মগবাজারের দোতলা বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। ২৫ মার্চ রাতে দুঃস্বপ্নের মত একটি রাত কাটান তাঁরা। ২৭ মার্চ দেশের বাড়ি নরসিংদীর ভাটপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন কখনো নৌকা কখনো হেঁটে সেখানে উপস্থিত হন কিন্তু দুই তিন দিন পর সেখানেও দিনে পাক হানাদারদের অত্যাচার এবং রাতে ডাকাতি শুরু হয়। জুনের মাঝামাঝি বর্ষাকাল, তাঁরা আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হন। আগরতলায় বেশ কিছুদিন থাকার পর খবরের কাগজ দেখে কলকাতা ১৪৪ নং লেনিন সরণীতে মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থায় যোগ দেন। তিনি এ স্কোয়াডের সঙ্গে মুক্তাঞ্চলে দেশাত্মবোধক ও সংগ্রামী গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করেন। জুলাই মাসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দিয়ে শব্দ সৈনিকের ভূমিকা পালন করেন।[২০] স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর নানামুখী ভূমিকা ইতিহাসে ভীষণভাবে উপেক্ষিত এবং অবহেলিত। প্রচলিত অর্থে যুদ্ধ বলতে পক্ষ-বিপক্ষ এবং অস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে ময়দানে লড়াই করা বোঝায় কিন্তু যাঁরা খাদ্য, আশ্রয়, অর্থ, শুশ্রুষা, শব্দ সৈনিক হিসেবে নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন তাঁদের অবদান কোথাও যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়নি। নতুন প্রজন্মকে এ সকল মুক্তিকামী মহান নারীর অবদানের ইতিহাস সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্দোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে যেসকল নারী সঙ্গীতশিল্পী নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন : ড. সনজিদা খাতুন, শেফালী ঘোষ, কল্যাণী ঘোষ, স্বপ্না রায়, ডালিয়া নওশীন, শাহীন মাহমুদ, নায়লা জামান, নমিতা ঘোষ, উমা চৌধুরী, নাসরিন আহমেদ শিলু, মিতালী মুখার্জী, মালা খুররম, রুপা ফরহাদ, মাধুরী আচার্য্য, রমা ভৌমিক, বুলবুল মহলানবীশ, ঝর্ণা ব্যানার্জী, আফরোজা মামুদ, অরুনা সাহা, নীনা, ফ্লোরা আহমদ, বুলা মাহমুদ প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত প্রচারিত নারীসঙ্গীত শিল্পীগণের কণ্ঠে পরিবেশিত কিছু কালজয়ী জাগরণী গান–

---

[১৮] ড. জাহিদ হোসেন প্রধান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৫-১৬১।

[১৯] ঐ, পৃ.১৮৬-১৮৮।

[২০] ঐ, পৃ.১৯৭-১৯৯।

→ 'পূর্বের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে, আলোকে আলোকময়' গীতিকার: নয়ীম গহর, সুরকার: নয়ীম গহর ও আজাদ রহমান, শিল্পী:সাবিনা ইয়াসমিন, ফিরোজা বেগম, জিনাত রেহানা, রোকসানা সামাদ, লায়লা মোজাম্মেল, সুফিয়া আমিন প্রমূখ;

→ 'জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো' গীতিকার: নয়ীম গহর, সুরকার: নয়ীম গহর ও আজাদ রহমান, শিল্পী: সাবিনা ইয়াসমিন, ফিরোজা বেগম, জিনাত রেহানা, রোকসানা সামাদ, লায়লা মোজাম্মেল, সুফিয়া আমিন প্রমূখ; উল্লেখ্য উপরোক্ত গান দুটি মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস স্বাধীনবাংলা বেতার থেকে নিয়োমিত প্রচারিত হয়েছিল।

→ 'জয় বাংলা বাংলার জয়, হবে হবে হবে নিশ্চয়' গীতিকার: গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার: আনোয়ার পারভেজ, শিল্পী: শাহনাজ রহমতউল্লাহ ও অন্যান্য;

→ 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা' গীতিকার: গোবিন্দ হালদার, সুরকার: আপেল মাহমুদ, শিল্পী: লিডিং ভয়েজ স্বপ্না রায় ও অন্যান্য;

→ 'এসো স্মরণ করি, লাখো শহীদের আত্মদানে মুক্ত স্বদেশ, এসো সোনার বাংলা গড়ি' গীতিকার: ফেরদৌস হোসেন ভূঁইয়া, সুরকার: বাসব চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী: স্বপ্না রায়;

→ 'মিশে গেল কত নাম কত প্রাণ' গীতিকার: আবিদুর রহমান, সুরকার: সমর দাস, শিল্পী: সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়;

→ 'এক নদী রক্ত পেরিয়ে, বাংলার আকাশে রক্তিম সূর্য আনলে যাঁরা' গীতিকার: খান আতাউর রহমান, সুরকার: ঐ, শিল্পী:শাহনাজ রহমতউল্লাহ;

→ 'আমায় যদি প্রশ্ন করে আলো নদীর এক দেশ, বলবো আমি বাংলাদেশ' গীতিকার: গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার: আনোয়ার পারভেজ, শিল্পী: শাহনাজ রহমতউল্লাহ;

→ 'একতারা তুই দেশের কথা বলরে এবার বল' গীতিকার: গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুরকার: আনোয়ার পারভেজ, শিল্পী: শাহনাজ রহমতউল্লাহ;

→ 'ও আমার বাংলা মা তোর আকুল করা রূপের সুধায়' গীতিকার: আবুল ওমরাহ মো: ফকরুদ্দিন, সুরকার : আলাউদ্দিন আলী, শিল্পী: সাবিনা ইয়াসমিন;[২১]

গানের প্রথম কলি	গীতিকার
অন ধান্যে পুষ্পে ভরা	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো	আব্দুল গফ্ফার চৌধুরী
ও আমার জন্মভূমি জননী গো	---------
ছালাম ছালাম হাজার সালাম	ফজলে-এ-খোদা
বাঁধ ভেঙ্গে দাও-বাঁধ ভেঙ্গে দাও	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কারার ঐ লৌহ কপাট	কাজী নজরুল ইসলাম
শিকল পরার ছল মোদের ঐ	কাজী নজরুল ইসলাম
রক্তের প্রতিশোধ রক্তেই নেব	আপেল মাহমুদ
আমি এক বাংলার মুক্তিসেনা	নওয়াজিস হোসেন
আবার উঠেছে মহাঝড়	আব্দুল জব্বার
হুশিয়ার হুশিয়ার হুশিয়ার	আপেল মাহমুদ

[২১] বেলাল মোহাম্মদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ. ১২২-১২৪।

তীরহারা ঐ ঢেউয়ের সাগর	আপেল মাহমুদ
আমার নেতা তোমার নেতা	সমর দাশ (সুরকার)
মুক্তির একই পথ সংগ্রামে	সুজেয় শ্যাম (সুরকার)
চল বাঙালি চল	আব্দুল গনি বোখারী
চাঁদ তুমি ফিরে যাও	অজিত রায়
নাই ঈদ নাই ঈদ	---
সংগ্রাম আজ সংগ্রাম	---
এ ঘর দুর্গ	---
রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি	---
সাত কোটি	---
ওরে শোন রে	---
আজ বাংলা আমার	---
স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে	---
আমরা যখন মুক্ত হব	---
বিজয় নিশান উড়ছে	--- ইত্যাদি।[২২]

অন্যান্য শিল্পীগোষ্ঠী এবং নারী ব্যক্তিত্ব

'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি' এ মহান ব্রত নিয়ে যাঁরা যুদ্ধে গিয়েছিল সেই সকল যোদ্ধাদের প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করেছিল বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠী। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠী, এ শিল্পীগোষ্ঠীর উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন নুরজাহান মুর্শেদ; নারী শিল্পীবৃন্দ ছিলেন স্বপ্না রায়, রমা ভৌমিক, নমিতা ঘোষ, মাধুরী আচার্য, অরুণা সাহা, সুমিতা দেবী প্রমূখ। বাংলাদেশ তরুণ শিল্পীগোষ্ঠী, পরিচালনা পরিষদের সম্পাদিকা ছিলেন কল্যাণী ঘোষ, নারী শিল্পীবৃন্দ ছিলেন মিতালী মুখার্জী, পূর্ণিমা দাশ চৌধুরী, উমা খান চৌধুরী, জয়ন্তী লালা, দেবী চৌধুরী প্রমূখ। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কুশলী সমিতির নারী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সুমিতা দেবী, কবরী সরওয়ার, সুচন্দা রায়হান, মালা চৌধুরী, অমিতা বসু, গীতা দত্ত প্রমূখ।[২৩] 'শরণার্থী শিল্পীগোষ্ঠী'; পণ্ডিত বারীন মজুমদার তাঁর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি করেছিলেন। কবি, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ জনতা সকলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রশাসন কাঠামো, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রণকারী যে সকল নারী ব্যক্তিত্ব অবদান রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- লীনা রাণী চক্রবর্তী, প্রশাসনিক বিভাগের সহকারী দলিল রক্ষক; পারভীন হোসেন, সংবাদ বিভাগের ইংরেজি সংবাদ পাঠক; নাসরিন আহমেদ শিলু, সংবাদ বিভাগের ইংরেজি সংবাদ পাঠক; বেগম মুশতারী শফী, পাক্ষিক অনুষ্ঠান লেখক ও পাঠক, *রণাঙ্গনে বাংলার নারী ও দেশ গঠনে নারীর ভূমিকা* ; মেহের খন্দকার, পাঠিকা, *আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও মহিলা*; বুলবুল মহলানবীশ, পাঠিকা, *বাংলার মুখ*; নাট্যশিল্পীদের মধ্যে যারা ছিলেন তাঁরা হলেন: সুমিতা দেবী, লায়লা হাসান, ডা. কাজী তামান্না, বুলবুল মহলানবীশ, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়, অমিতা বসু, নাছরিন আহমেদ, তাজিন মোরশেদ প্রমূখ।[২৪]

---

[২২] ড. জাহিদ হোসেন প্রধান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২-১৭৩।

[২৩] এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৮,পৃ. ৯১-১০৫।

[২৪] ড. জাহিদ হোসেন প্রধান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪৬-২৬৪।

উপসংহার

বাঙালির শত সহস্র বৎসরের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের ইতিহাসের ধারায় মুক্তিযুদ্ধ একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়। আর এ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় নারী সমাজের অবদান সম্বলিত তথ্য সংকট থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট তা হচ্ছে নারীর প্রতি ইতিহাসের অনমণীয়তা। গোবিন্দ হালদারের সেই কালজয়ী জাগরণী গান- 'যে নারীর মধু প্রেমেতে আমার রক্ত দোলে/যে শিশুর মায়া হাসিতে আমার বিশ্ব ভোলে/যে গৃহ কপোত সুখ-স্বর্গের দুয়ার খোলে/সেই শান্তির শিবির বাঁচাতে শপথ করি'-লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার প্রাণে সাহস সঞ্চার করেছিল। যুগে যুগে নারী যেমনিভাবে অনুপ্রেরণার অভেদ্য দেয়াল হয়ে করুণাময়ীর বেশে বিজয় ছিনিয়ে আনতে চরম ক্রান্তিলগ্নে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তেমনি তাঁর সুললিত কণ্ঠ ৭১'এ মুক্তিসেনাদের দেশ মাতৃকাকে স্বাধীন করার ব্রতনেশায় মাতাল করেছিল। স্বাধীন শোষণমুক্ত একটি স্বদেশ লাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্ভাসিত মানুষ শক্তি সঞ্চার করেছিল জাগরণী গানের মাধ্যমে, যে গান কণ্ঠে তুলে নিয়েছিলেন অনেক নারী সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব। সুতরাং মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের সে অবদান ক্ষুদ্র করে দেখার কোন অবকাশ নেই। সংরক্ষিত তথ্যের অভাবে যাঁদের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি তাঁদের নিকট মার্জনা প্রার্থনা। বাঙালি জাতি তাঁদের শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করে যাঁরা এই বিজয়ের পথ রচনা করেছেন রক্ত দিয়ে, অশ্রু দিয়ে, পুত্র দিয়ে, স্বামী দিয়ে, পিতা ভাইকে বলী দিয়ে– সেসব অজ্ঞাতনামাদের। ইতিহাসে তারা উল্লেখিত হবেন না সত্য, কিন্তু কৃতজ্ঞচিত্তে বাঙালি কখনো ভুলবে না এ আত্মোৎসর্গের অমর স্মৃতি যা গৌরবের সাথে মিশে আছে অসীম বেদনায় (আবুল ফজল, ১৯৮৩)। পরিশেষে প্রশ্ন থেকে যায় যেসকল নারী সঙ্গীতশিল্পী এবং নারী শব্দ সৈনিকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের সকলকে কি আমরা যথাযোগ্য সম্মান দিতে পেরেছি? সর্বপরি যে সোনার বাংলার জন্য তাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন সে বাংলাদেশ কি আমরা তাঁদের দিতে পেরেছি?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এস আর মীর্জা, *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯।

কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬।

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র*, খণ্ড-৫,১৪,১৫, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৩।

মঈদুল হাসান, *মূলধারা'৭১*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা, ১৯৯২।

আবুল ফজল, *দুর্দিনের দিনলিপি*,ঢাকা: মুক্তধারা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৩, পৃ.২১২-২১৩।

গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা স্বদেশী গান*, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী, ১৯৮৩।

গুভাষ চৌধুরী, 'মুক্তির গান', *দেশ বিনোদন*, কলকাতা, ১৩৯১।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (১-১৬ খণ্ড), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০০৪।